উপলব্ধির বিভিন্ন পথ (Ways of Relisation):

কিভাবে আত্মা অমরত্বের উপলব্ধি করবে? এমন প্রশ্নের উত্তরে বিবেকানন্দ 'যোগ' এর উল্লেখ করেছেন। যোগ কি ? এমন প্রশ্নের দুই রকমের অর্থ হতে পারে। এক 'সংযুক্ত হওয়া' অথবা 'নিয়মানুবর্ত্তিতা-অভ্যাস করা' দুই অর্থকেই তিনি একত্রিত করেছেন। আমেরিকায় প্রথমবার থাকার সময়ে জনৈক পাশ্চাত্ত্য শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে লিখিত বক্তৃতায় তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন:

'মুক্ত হওয়াই আমাদের জীবনের প্রধান সমস্যা। আমরাই পরব্রহ্ম -এই উপলব্ধি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের মধ্যে হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মুক্তিলাভে সমর্থ হই না। আর একথা অতি স্পষ্ট এবং অতি সত্য। এই অনুভূতি লাভের অনেক পথ আছে এবং এদের একটা সাধারণ নামও আছে। আর তাহল 'যোগ' (যুক্ত করা, আমাদের সত্তার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করা)। আর এই যোগকে আমরা মূলত চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রত্যেক যোগই গৌণত সেই পরমকে উপলব্ধি করার পথ। সেজন্যে এগুলো বিভিন্ন রুচির পক্ষে উপযোগী।

এখন আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কল্পিত মানবই প্রকৃত মানব হয় না বা 'পরম' হয় না। পরমে কখনই রূপান্তরিত হওয়া যায় না। পরম নিত্যমুক্ত, নিত্যপূর্ণ। কিন্তু সাময়িকভাবে অবিদ্যা এর স্বরূপ আবৃত করে রেখেছে। অবিদ্যার এই আবরণ সরিয়ে ফেলতে হবে। প্রত্যেক ধর্মই এক একটি যোগের প্রতিনিধি। যোগগুলো কেবল অবিদ্যার আচরণ উন্মোচন করে এবং আত্মাকে নিজের স্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

Scanned by CamScanner

আবার অভ্যাস ও বৈরাগ্য মুক্তির প্রধান সহায়। আসক্তি শূন্যতাকে বলা হয় 'বৈরাগ্য', কারণ ভোগৈষণা বন্ধন সৃষ্টি করে। যে কোনো একটি যোগের নিয়ত অনুশীলনকে 'অভ্যাস' বলা হয়।'

জ্ঞানের পথ (জ্ঞানযোগ):

জ্ঞানের পথ বলতে বিবেকানন্দ বুঝেছেন অজ্ঞতাজনিত 'বন্ধন' এর উপলব্ধি। তার মতে 'অজ্ঞতা' হল বস্তুর যথার্থ প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা। সত্য এবং অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারাই অজ্ঞতা।

তাঁর মতে, জ্ঞানযোগ তিনভাগে বিভক্ত: (১) শ্রবণ, অর্থাৎ আত্মা একমাত্র সৎ পদার্থ এবং অন্যান্য সব কিছুই মায়া - এই তত্ত্ব শোনাই হল শ্রবণ। (২) মনন, অর্থাৎ সবদিক থেকে এই তত্ত্বকে বিচার করা। (৩) নির্দিধ্যাসন, অর্থাৎ সমস্ত বিচার ত্যাগ করে তত্ত্বকে উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধির আবার চারটি সাধন। যথা:—১) ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা রূপ দৃঢ় ধারণা, ২) সর্বপ্রকারের এষণা ত্যাগ, ৩) সমদমাদি ও ৪) মুমুক্ষুত্ব। তত্ত্বের নিরন্তর ধ্যান এবং আত্মাকে তার প্রকৃত স্বরূপ স্মরণ করিয়ে দেওয়া এই যোগের একমাত্র পথ। এই যোগ সর্বশ্রেষ্ঠ কিন্তু কঠিনতম। এই যোগ অনেকের বুদ্ধিগ্রাহ্য হতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত অল্প সংখ্যক মানুষ এই যোগে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন।

জ্ঞানযোগে এক চরম সত্যের উপলব্ধির জন্য চাই একাগ্রতা। কিন্তু এই 'একাগ্রতা' সহজ পথ নয়। একাগ্রতার জন্য প্রয়োজন আত্মার সমগ্র শক্তি। দৈহিক ক্রিয়ার জন্যই বাজে খরচ হয়ে যায় আত্মার শক্তি। তাই আত্মার শক্তিকে দৈহিক ক্রিয়া-কলাপ থেকে যতদূর সম্ভব প্রত্যাহার করে নিতে হবে। অর্থাৎ দেহ ও ইন্দ্রিয়কে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বিষয়টিকে সুন্দরভাবে বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর লেখায় এভাবে :

"প্রথমত ধ্যান নেতিমূলক হবে। অর্থাৎ সমস্ত চিন্তাকে দূর করে দিতে হবে। যা মনে আসে তা প্রবল ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ করে তাকে থামিয়ে দিতে হবে।

এরপর দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের যা প্রকৃত স্বরূপ সেই ব্যাপারে মনোনিবেশ কর। মনের মধ্যে তিনটি ভাব আনো। সৎ-চিৎ-আনন্দ। অস্তিভাব, জ্ঞান-স্বভাব এবং প্রেমস্বরূপ।

ধ্যানের মাধ্যমেই দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের ঐক্যের অনুভূতি আসে। মনে হয়, যিনি দেখছেন, এবং যাকে দেখা হচ্ছে, তাঁরা এক, অভিন্ন।"

এই জ্ঞানের নিরন্তর অভ্যাস দৈহিক কামনা-বাসনাকে প্রথমে নিয়ন্ত্রণ, তারপরে নিঃশেষ করে। এটাই 'আত্মত্যাগ' (Renunciation)। বিবেকানন্দের মতে, এই 'আত্মত্যাগ' হল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় স্তর জ্ঞানযোগ অভ্যাসের পক্ষে। এই আত্মত্যাগ সমস্ত রকম স্বার্থপরতা থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করে। একে বলে 'বৈরাগ্য'। এই বৈরাগ্য এলে আত্মত্যাগের আর এক সদর্থক দিক উন্মুক্ত হয় আমাদের কাছে—যাকে ব্রহ্মানুভূতি-ই বলা যায়, তখন আমাদের উপলব্ধি হবে:

"ঊর্দ্ধ আমার দ্বারা পরিপূর্ণ। অধঃ আমার দ্বারা পরিপূর্ণ। মধ্য আমার দ্বারা পরিপূর্ণ। আমি নিজে সব কিছুতে আছি অর্থাৎ সর্বভূতে বিরাজিত। আবার সব কিছু অর্থাৎ সর্বভূত আমার মধ্যে বিরাজ করছে। ওম,তৎ,সৎ-আমিই সেই। আমি মনের উর্ধে সৎ স্বরূপ। আমি বিশ্বের একমাত্র আত্মাস্বরূপ। আমি সুখও নই, দুঃখও নই।

আত্মা নয়, দেহই পান করে, আহার ইত্যাদি করে। কিন্তু আমি দেহ নই, মন নই। সোহহম্। আমিই সেই।

Scanned by CamScanner

আমি সাক্ষীস্বরূপ। আমি দ্রষ্টা। যখন দেহ সুস্থ থাকে, আমি সাক্ষী। আবার যখন কোন রোগ আক্রমণ করে তখনো আমি সাক্ষীস্বরূপ।

আমি সচ্চিদানন্দ। আমিই সার পদার্থ। জ্ঞানের অমৃতস্বরূপ। অনন্তকালে আমার কোনো পরিবর্তন নেই। আমি শান্ত দীপ্যমান পরিবর্তন-রহিত। আমি শান্ত, আলোকময়, আমার কোনো পরিবর্তন নেই।"

ভক্তির পথ (ভক্তিযোগ):

এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের অভিমত হল: 'ভক্তি বা পূজা বা কোনো না কোনো প্রকার অনুরক্তি মানুষের সর্বাপেক্ষা সহজ, সুখকর এবং স্বাভাবিক পথ। এই বিশ্বের স্বাভাবিক অবস্থা হচ্ছে আকর্ষণ। আর তাই কিন্তু নিশ্চিতভাবে একটি চূড়ান্ত বিচ্ছেদে পরিণত হয়। তা সত্ত্বেও প্রেম মানব-হৃদয়ে মিলনের একটা সহজাত প্রবৃত্তি। প্রেম নিজে দুঃখের একটা বড় কারণ হলেও যোগ্য বিষয়ের প্রতি নিয়োজিত হলে মুক্তিকে বহন করে। ভক্তির লক্ষ্য ঈশ্বর। প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ বিনা প্রেমে থাকতে পারে না। প্রথমে এমন একজন প্রেমাস্পদ থাকা চাই, যিনি আমাদের প্রেমের প্রতিদান দিতে পারেন। সুতরাং ভক্তের ভগবানকে এক অর্থে মানবীয় ভগবান হতেই হবে। আবার তিনি অবশ্যই প্রেমময় হবেন। এই প্রকার ভগবান আছেন বা নেই—এই প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও একথা সত্য যে, যাদের হৃদয়ে প্রেম আছে, তাদের কাছে এই নির্গুণ ব্রহ্মই প্রেমময় ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মরূপে আবির্ভূত হন।

ভগবান বিচারক, শাস্তিদাতা বা এমন একজন, যাঁকে ভয়ে মানতে হবে বা পূজা করতে হবে—এসব ভাব নিম্ন পর্যায়ের পূজা। এই প্রকার পূজাকে প্রেমের পূজা বলা যায় না। এইসব পূজা অবশ্য ধীরে ধীরে উচ্চাঙ্গের পূজায় রূপায়িত হয়। আমরা প্রেমকে একটা ত্রিভুজের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব। ধরা যাক্, এই ত্রিভুজের পাদদেশের প্রথম কোন "ভয়শূন্যতা'। যতক্ষণ ভয় থাকবে, ততক্ষণ তা প্রেম নয়। প্রেম সব ভয় দূর করে। তাই শিশুকে রক্ষা করার জন্যে মা নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও বাঘের সম্মুখে যান। দ্বিতীয় কোন হল প্রেম কখনও কিছু চায় না বা ভিক্ষে করে না। তৃতীয় বা শীর্ষকোণ হচ্ছে - প্রেমের জন্যেই প্রেম। এই প্রেম আবার বিষয়-বিষয়ী-সম্পর্কশূন্য। এটাই হল সর্বোচ্চ বিকাশ এবং পরমের সঙ্গে সমার্থক।'

ভক্তের ভক্তির বিভিন্ন প্রকাশের কথাও তিনি আলোচনা করেছেন এভাবে: 'প্রথমে 'শ্রদ্ধা'। লোকে মন্দির এবং দেবস্থান সম্পর্কে এত শ্রদ্ধা রাখে কেন? এই সব জায়গায় ভগবানের পূজো হয় বলে। এসব জায়গায় গেলে আধ্যাত্মিকভাব জেগে ওঠে বলে। এই সব জায়গার সঙ্গে ভগবানের সত্তা জড়িয়ে আছে বলে। ধর্মগুরুদের প্রতি সব দেশের লোকই এত শ্রদ্ধা রাখে কেন? তাঁরা সকলেই সেই এক ঈশ্বরের মহিমার কথাই বলেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জাগারই কথা। এই শ্রদ্ধার মূল হল ভালবাসা। যাকে আমরা ভালোবাসি না, তার প্রতি শ্রদ্ধা জাগে না।

এরপর 'প্রীতি'—ঈশ্বর চিন্তায় সুখ বা আনন্দ পাওয়া। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে মানুষ কি তীব্র আনন্দ পেয়ে থাকে। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উপকরণ পাওয়ার জন্যে মানুষ সব জায়গায় ছুটে যায়। চরম বিপদের সামনেও পড়ে। ঠিক এই রকমের ভালোবাসা চাই ভক্তের। এই ভালোবাসার মুখ ফেরাতে হবে ভগবানের দিকে।

এরপর সবচেয়ে মধুর যন্ত্রণা 'বিরহ'—প্রিয়র অভাব হেতু গভীর দুঃখ। এই দুঃখ সংসারের সব দুঃখের মধ্যে মধুর—বড়ই মধুর। 'ঈশ্বরকে পেলাম না, জীবনে একমাত্র পাওয়ার জিনিস

Scanned by CamScanner

পেলাম না' বলে মানুষ যখন খুব আকুল হয়ে ওঠে, তার জন্যে যন্ত্রণায় অস্থির আর পাগল হয়ে ওঠে, তখনই বোঝা যায় ভক্তের 'বিরহ' এসেছে। মনের এই অবস্থায় প্রিয় ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। বাস্তবের ভালোবাসাতেও কখনও কখনও প্রেমিক-প্রেমিকার ভেতরে পাগলের মতো এই বিরহ জাগে। নারী পুরুষের মধ্যে গভীর ভালোবাসা হলে তারা যাদের ভালোবাসে না তারা কাছে এলেই বিরক্ত হয়।

সেইরকম হৃদয়ে যখন পরাভক্তি জাগে, তখন ভক্ত যে সব জিনিস বা যে সব মানুষজন ভালোবাসে না তারা কাছাকাছি এলেই অসহ্য মনে করে। ঈশ্বর ছাড়া আর সব কথাও তখন সাধকের কাছে বিরক্তিকর। 'তাঁর সম্পর্কে, কেবল তাঁর সম্পর্কে ভাবো, আর সব ভাবনা ছেড়ে দাও।' যাঁরা কেবল ঈশ্বর আলোচনা করেন তাঁদেরকেই ভক্ত বন্ধু মনে করেন। যারা অন্য বিষয়ে কথা বলে তাদেরকে তাঁর শত্রু বলে মনে হয়।

আরো একটা উঁচু পর্যায় আছে যখন বেঁচে থাকাটাও প্রেম পুরুষের জন্যে। তাঁকে ছাড়া ভক্তের এক মুহূর্তও বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। শাস্ত্রে এই পর্যায়কে বলে 'তদর্থপ্রাণস্থান'। আর সেই প্রেম পুরুষের ভাবনা হৃদয়ে থাকে বলেই বেঁচে থাকা সুখের হয়ে ওঠে। অন্য কথায়—প্রেম পুরুষের ভাবনা থাকে বলেই জীবনকে মধুর মনে হয়।

'তদীয়তা' হল তার হয়ে যাওয়া। ভক্তিমতে সাধক সিদ্ধিলাভ করেন তখন আসে এই 'তদীয়তা'। যখন তিনি ভগবানের পা স্পর্শ করেন তখন তাঁর প্রকৃতি পুরোপুরি পাল্টে যায়। পবিত্র হয়ে যায়। তখন তাঁর জীবনের লক্ষ্য পূর্ণ। তবু অনেক ভক্ত কেবল ভগবানের আরাধনার জন্যেই বেঁচে থাকেন। এই জীবনে এটাই তাঁদের একমাত্র সুখ - এটি তাঁরা ছাড়তে চান না। 'হে রাজা, হরির গুণপনা এমনই মনোরম যে যাঁরা আত্মায় পরমশান্তি পেয়েছেন, মনের জট যাঁদের ছিঁড়ে গেছে, তাঁরাও ঈশ্বরকে নিরাসক্তভাবে ভক্তি করেন।' এই ঈশ্বরকে দেবতারা, মুক্তিকামীরা এবং ব্রহ্মবাদীরাও উপাসনা করে থাকেন।

এভাবে যে ঈশ্বরকে ভালোবাসে সে সমগ্র জগৎকেও ভালোবাসে; কেননা সমগ্র জগৎটাই যে তার।'

কর্মের পথ (কর্মযোগ):

বিবেকানন্দের মতে, 'কর্মযোগ হল কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করা। ভালো অথবা মন্দ কর্ম করলে ওই কর্মের ফল অবশ্যই ভালো বা মন্দ হবে। যদি অন্য কোন কারণ না থাকে তবে কোনো শক্তিই তার কাজ রোধ করতে পারে না। সৎকর্মের ফল সৎ এবং অসৎ কর্মের ফল অসৎ হবে। এবং মুক্তির কোনো সম্ভাবনা না রেখে আত্মা চিরবন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে। কর্মের ভোক্তা দেহ অথবা মন। আত্মা কখনই কর্মের ভোক্তা হতে পারেনা; কর্ম কেবল আত্মার সম্মুখে একটি আবরণ নিক্ষেপ করতে পারে। অবিদ্যা - অশুভ কর্মের দ্বারা নিক্ষিপ্ত আবরণ। সৎ কর্ম নৈতিক শক্তিকে দৃঢ় করতে পারে এবং এইভাবে নৈতিক শক্তির দ্বারা অনাসক্তির অভ্যাস হয়। নৈতিক শক্তি অসৎ কর্মের প্রবণতা উৎপাদন করে এবং চিত্ত শুদ্ধ করে। কিন্তু যদি ভোগের উদ্দেশ্যে কর্ম করা হয়, তাহলে ওই কর্ম সেই বিশেষ ভোগটি উৎপাদন করলেও চিত্ত শুদ্ধ করবে না। সুতরাং ফলাসক্তিশূন্য হয়ে সমস্ত কর্ম করতে হবে।

কর্মযোগীকে সমস্ত ভয় ও ইহামুত্রফলভোগ চিরকালের জন্যে ত্যাগ করতে হবে। উপরন্তু এষণাবিহীন কর্মসকল বন্ধনের মূল স্বার্থপরতা বিনষ্ট করবে। কর্মযোগীর মূলমন্ত্র "নাহং নাহং,

Scanned by CamScanner

তুই, তুই'' এবং কোনো আত্মত্যাগই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট নয়। স্বর্গপ্রাপ্তি নাম, যশ বা কোনো জাগতিক সিদ্ধির জন্য তিনি কর্ম করেন না। এই নিঃস্বার্থ কর্মের ব্যাখ্যা ও উপপত্তি কেবল জ্ঞানযোগেই আছে।'

প্রাসঙ্গিকভাবে তিনি গীতার নিষ্কাম কর্মের উদাহরণ দিয়ে কর্মযোগের পথ সম্পর্কে বলেছেন, 'গীতা কর্মযোগ শিক্ষা দেয়। যোগারূঢ় হয়ে আমাদের কর্ম করতে হবে। এই যোগযুক্ত অবস্থায় ছোট্ট 'অহং' বোধ থাকে না। যোগযুক্ত হয়ে কর্ম করলে 'আমি এটা করেছি, ওটা করেছি'— এই বোধ কখনও থাকে না। পাশ্চাত্ত্যের লোকেরা এই বোধ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তারা বলে যে, যদি এই অহংবোধ না থাকে, যদি এটা বিলুপ্ত হয় তবে মানুষ কিভাবে কর্ম করতে পারে? কিন্তু আমিত্ববোধ ত্যাগ করে যোগযুক্ত চিত্তে কর্ম করলে তা অনন্তগুণ উৎকৃষ্টতর হবে এবং প্রত্যেকেই নিজের জীবনে এটা অনুভব করে থাকবে।

আমরা খাদ্যের পরিপাকক্রিয়া প্রভৃতি বহু কর্ম অবচেতনভাবে করি। অন্যান্য অনেক কর্ম জ্ঞাতসারে, আবার অনেক কর্ম ক্ষুদ্র আমিত্বের লোভে যেন সমাধিমগ্ন হয়ে করি। চিত্রকর যদি অহংবোধ ভুলে চিত্রাঙ্কনে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়, তবে সে অপূর্ব সুন্দর ছবিগুলো আঁকতে পারবে। ভালো পাচক যেসব খাদ্যবস্তু নিয়ে কাজ করে, তাতেই সে সম্পূর্ণ মন দিয়ে থাকে। তখন সাময়িকভাবে তার অন্যান্য বোধ সবই চলে যায়। এভাবেই তারা তাদের অভ্যস্ত কোনো কাজ নিখুঁতভাবে সম্পাদন করতে সমর্থ হয়। গীতা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সমস্ত কর্মই এভাবে সম্পন্ন হওয়া উচিত। যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন, তিনি যোগযুক্ত হয়ে সমস্ত কর্ম করেন। ব্যক্তিগত স্বার্থ খোঁজেন না। এভাবে কর্মসম্পাদন দ্বারাই জগতের মঙ্গল হয়। তা থেকে কোনো অমঙ্গল হতে পারে না।'

তিনি মনে করতেন এই নিঃস্বার্থ কর্মের দ্বারাই আমাদের মন শুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং আমরা সকলের সাথে নিজেকে এক করে চিনতে পারি। এই উপলব্ধিই অমরত্ব।

মনোবিজ্ঞানের পথ (রাজযোগ):

রাজযোগকে বলা যায় দেহ ও মনকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে 'অমরত্ব' উপলব্ধির পথ। এই নিয়ন্ত্রণ, জ্ঞানযোগে যেমন নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে তেমন নয়, এই নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে দেহ ও মনকে কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে। পতঞ্জল এই যোগের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তাঁর যোগসূত্রে এবং কারো কারো মতে এটাই সবচেয়ে দ্রুত এবং সরাসরি মোক্ষলাভের পদ্ধতি। এ কারণেই রাজযোগকে বলা হয় সবচেয়ে সেরা যোগ। এই যোগের লক্ষ্য ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব লাভের উপলব্ধি।

তাঁর মতে, রাজযোগ-বিজ্ঞান প্রথমত মানুষকে তার নিজের ভেতরের অবস্থাগুলো পর্যবেক্ষণ করবার উপায় দেখিয়ে দেয়। মনই ওই পর্যবেক্ষণের যন্ত্র। মনোযোগের শক্তি তখনই মনকে বিশ্লেষণ করবে ও আমাদের আলোকিত করতে সাহায্য করবে যখন ওই শক্তিকে ঠিকমতো পরিচালনা করে তাকে অন্তর্জগতের দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে। মনের এই শক্তিগুলো হচ্ছে চারপাশে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা আলোকরশ্মি। এই রশ্মিগুলো কেন্দ্রীভূত হলেই সবকিছু আলোকিত করে। এটাই আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উপায়। কি বাইরের জগতে কি ভেতরের জগতে সবাই এই শক্তি ব্যবহার করছে। তবে বাইরের জগতে বৈজ্ঞানিক যে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি প্রয়োগ করেন, মনোবিদ্ তাই প্রয়োগ করেন মনের ওপর। এই প্রয়োগে অনেক অভ্যাস দরকার। ছেলেবেলা

Scanned by CamScanner

থেকেই আমরা শুধু বাইরের বস্তুতেই মন দেওয়ার শিক্ষা পেয়েছি। অর্ন্তজগতের বস্তুতে নয়। এ জন্যই আমাদের মধ্যে বেশীরভাগই অন্তর্যন্ত্রের পর্যবেক্ষণ শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। মন যাতে নিজের স্বভাব জানতে পারে, নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারে, সেজন্য তার বর্হিমুখী গতিকে আটকে তাকে অর্ন্তমুখী করে তোলা উচিত। তবে এজন্য মনের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে নিজের ওপরে প্রয়োগ করা দরকার।

তিনি মনে করেন, রাজযোগ অনুসারে বর্হিজগত অর্ন্তজগতের স্থূল রূপ মাত্র। সূক্ষ্ম সর্বত্রই কারণ ও স্থূল সর্বদাই কার্য। কাজেই বর্হিজগত হল কার্য ও অর্ন্তজগত তার কারণ। পাশাপাশি বর্হিজগতের শক্তিগুলো অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্মতর শক্তির স্থূলভাগ মাত্র। যে ব্যক্তি এই আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলোকে আবিষ্কার করে তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে শিখেছেন, সমগ্র প্রকৃতি তাঁরই নিয়ন্ত্রণে থাকে। সমস্ত জগতের ওপর প্রভুত্ব করা ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করার কাজকেই যোগী তাঁর নিজের কর্তব্য বলে মনে করেন। তিনি এমন একটা জায়গায় আসতে চান, যেখানে, আমরা যেগুলোকে বলি 'প্রকৃতির নিয়মাবলী'। সেগুলো তার ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না, যে অবস্থায় তিনি ওগুলোকে অতিক্রম করতে পারেন। তিনিই সমগ্র প্রকৃতি, বর্হিজগত ওঅর্ন্তজগতের একমাত্র প্রভু হতে পারেন। মানবজাতির উন্নতি ও সভ্যতার অর্থ হল—এই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা।

বিবেকানন্দের বিশ্লেষণে, 'রাজযোগকে আটভাগে ভাগ করা যায়। ১ম-যম অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অচৈর্য, ব্রহ্মচর্য,অপরিগ্রহ। ২য়-নিয়ম অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠ ও ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ। ৩য়- আসন অর্থাৎ বসবার নিয়ম। ৪র্থ- প্রাণায়াম। ৫ম- প্রত্যাহার অর্থাৎ মনের বিষয়াভিমুখী গতি ফিরিয়ে তাকে অর্ন্তমুখী করা। ৬ষ্ঠ-ধারণা অর্থাৎ একাগ্রতা। ৭ম-ধ্যান। ৮ম-সমাধি অর্থাৎ জ্ঞানাতীত অবস্থা।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, যম ও নিয়ম চরিত্র গঠনের শিক্ষা। এদের ভিত্তি হিসেব না রাখলে কোনোরকম যোগ-সাধনাই সাফল্যলাভ করবে না। যম ও নিয়ম দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হলে যোগী তাঁর সাধনার ফল অনুভব করতে আরম্ভ করেন। এগুলোর অভাবে সাধনার কোনো ফলই ফলবে না। যোগী কায়মনোবাক্যে কারও প্রতি কখনো অনিষ্ঠভাব পোষণ করবেন না। করুণার ভাব শুধু মনুষ্যজাতিতেই আবদ্ধ থাকবে না। তা যেন আরও এগিয়ে সমস্ত জগতকে আলিঙ্গন করে।

চারপ্রকার যোগ সম্পর্কে শেষ কথা:

যদিও বিবেকানন্দ যোগের চারটি পথের কথা বলেছেন, তবু পরিণামে এই বিভিন্ন পথগুলি একই লক্ষ্যে উপনীত হবে এমন কথাও তিনি বলেছেন। মানুষের বিভিন্ন প্রকৃতি, ক্ষমতার তারতম্য অনুযায়ী এই পথগুলো নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। কেউ প্রকৃতি অনুযায়ীই জ্ঞানমার্গী, কেউ বা আবার কর্মমার্গী। তাই আপন ক্ষমতা ও প্রকৃতি অনুযায়ীই ব্যক্তি মোক্ষলাভের পথ নির্বাচন করবে।

এছাড়াও এই পথগুলি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন পথ নয়। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি পথের সঙ্গেই অন্যান্য পথগুলির একটা সংযোগ ও সাহচর্য আছে। এমন নয় যে যিনি ভক্তিযোগে আপ্লুত হয়েছেন তার জ্ঞানযোগের কোন প্রয়োজন নেই।

Scanned by CamScanner